ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ৪৩, ১৪৩২/২০২৫, ৬৩-৭৮
DOI: https://doi.org/10.59815/isp.vol4304

সুন্দরবনের প্রান্তিক জনপদে সুফি খালাস খাঁ : মিথ ও বাস্তবতা

ইদ্রিস আলী
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract: The reclamation of the Sundarbans and the introduction of Islam in the Khalas Khan region during the Sultani era mark an important turning point in Bengal's socioreligious development. A lot of land reclamation work was done at this time, clearing impenetrable mangrove forests to provide space for farming and habitation. In this process, Muslim pioneers-including Sufi saints like Khalas Khan-were crucial. In addition to helping the local population convert to Islam, these figures also brought in new cultural and social customs. In order to increase his power in isolated areas, Khalas Khan built roads and tanks. Islamization of the area occurred gradually as a result of the combination of religious propagation and agrarian growth, which firmly ingrained Islamic customs in the rural fabric. The Sundarbans periphery is an important area in Bengali Islamic history because of the dual dynamic of environmental change and religious growth that created the foundation for a long-lasting Muslim presence there.

Key Words: Khalas Khan, Sundarbans, Sufism, Archeology, Reclamation.

ভূমিকা

বাংলা অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারে রাজনৈতিক শক্তির সহযোগিতায় সুফিদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি দক্ষিণ এশিয়ায় ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরকরণে মুসলমান ধর্মপ্রচারকদের অবদান ছিল সর্বাগ্রে। সুফিদের আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমেই যে বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে এ বিষয়ে সকল ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিকগণ একমত পোষণ করেছেন।[১] দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় আগত সুফিরা ধর্মের বাণী প্রচারের পাশাপাশি প্রশাসনিক ও জনকল্যাণে নিজেদের সম্পৃক্ত করেছিলেন। সুন্দরবন আবাদ করে জনবসতি নির্মাণ ও ইসলাম প্রচারে যে সমস্ত সুফি-সাধকের অবদান রয়েছে তন্মধ্যে খালাস খাঁ অন্যতম। ১৫ শতকের মধ্যভাগে খান জাহান আলীর সাথে তাঁর কিছু বিশ্বস্ত অনুচর দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় আগমন করেন। খান জাহান কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে একটি দল কপোতাক্ষের কূল ধরে দক্ষিণ দিকে সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে খুলনার কয়রা উপজেলার বেদকাশিতে পৌঁছান।[২] বেদকাশিতে যে সুফি-সাধকের উত্তরাধিকার এখনো টিকে আছে তাঁর নাম খালাস খাঁ। বেদকাশীর খালাস খাঁ'র দিঘি এখনো তাঁর কীর্তি বহন করছে। খালাস খাঁ'র ঢিবি আর দিঘি ছাড়া আর কোনো কীর্তিচিহ্ন এখন আর খুঁজে

পাওয়া যায় না। ঢিবির এক পাশে খালাস খাঁ'র মাজার আর অন্যপাশে একটা মসজিদ বা খানকা রয়েছে বলে অনুমান করা হয়। ঢিবিটিতে সুলতানি আমলের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত পাতলা ইটের ভগ্ন গাঁথুনি ও ইমারতের অসংখ্য ভগ্ন টুকরা খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। জনশ্রুতি আছে যে, এই অঞ্চলের ঘন জঙ্গল পরিষ্কার করে বসতি নির্মাণের পাশাপাশি দিঘি, রাস্তাঘাটসহ নানাবিধ কল্যাণমূলক কাজ ও আধ্যাত্মিকতা চর্চার মধ্য দিয়ে ইসলাম প্রচারে অবদান রেখেছিলেন সুফি খালাস খাঁ। জনশ্রুতি ও সুফিবাদের তাত্ত্বিক কাঠামোর ভিত্তিতে এই প্রবন্ধে খালাস খাঁর কার্যাবলি বিশ্লেষণ করা হবে। খালাস খাঁ সংক্রান্ত গবেষণার মাধ্যমে সুন্দরবন অঞ্চলে মানব বসতি ও ইসলাম প্রচারের অজানা অধ্যায় উন্মোচিত হবে।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আলোচ্য গবেষণার লক্ষ্য হলো: প্রচলিত তথ্য ও সুফিবাদের তাত্ত্বিক কাঠামোর আলোকে সুন্দরবনের প্রান্তিক জনপদে খালাস খাঁর আবাদি, আধ্যাত্মিক ও মানবিক কর্মকাণ্ডের ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ করা। বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য হলো: সুন্দরবনের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মাঝে সুফিবাদের সম্মোহনী শক্তি ও সাংগঠনিক দক্ষতা নিরূপণ, জঙ্গল পরিষ্কার করে নতুন বসতি স্থাপন, আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় প্রভাবের ফলাফল হিসেবে ইসলাম ধর্মে অন্তর্ভুক্তি, প্রান্তিক মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং বর্তমানে সুন্দরবনের জনজীবনে খালাস খাঁর প্রভাব বা স্মৃতি টিকে থাকা প্রভৃতি বিষয়ের অনুসন্ধান।

গবেষণা প্রশ্ন

খালাস খাঁ সংক্রান্ত গবেষণায় যে প্রশ্নের উত্তর জানা জরুরি তা হচ্ছে:

ক. স্থানীয় ও অভিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও সামাজিক কল্যাণে খালাস খাঁর অবদান কী ছিল?

খ. সুন্দরবনের প্রান্তিক জনপদে খালাস খাঁ কীভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন?

গ. সুন্দরবনের বর্তমান জনমানসে সুফি খালাস খাঁর উত্তরাধিকার কতটা টিকে আছে এবং কীভাবে তা চর্চিত হচ্ছে?

এসব প্রশ্নের উত্তর বাংলার সামাজিক ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এজন্য আলোচ্য বিষয়ে অনুসন্ধান জরুরি।

গবেষণা পদ্ধতি

আর্কিওলজিক্যাল সাইট সার্ভের ক্ষেত্রে প্রত্নস্থলের কয়েকটি নির্দিষ্ট উপাদান নির্ণয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্নতাত্ত্বিক কোনো স্থান জরিপ করার করার ক্ষেত্রে Kenneth L. Feder কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন।[৩] যেমন মানব সৃষ্ট বা ব্যবহার্য বস্তু (Artifacts), মাটির সাথে যুক্ত স্থায়ী নিদর্শন (Features) ও মানব সৃষ্ট মৃত্তিকা স্তর (Anthropic Soil Horizon)। উপরোল্লিখিত উপাদানগুলোর উপস্থিতি বা কার্যকারিতা শনাক্ত করার লক্ষ্যে একটি জরিপ প্রোগ্রাম ডিজাইন করতে হলে পরিবেশগত (Environmental), সাংস্কৃতিক (Cultural) ও ব্যাবহারিক (Practical) –এই তিনটি

বিষয় বিবেচনায় নিতে হয়। Harry J. Shafer ও অন্যান্যরা যেটিকে দৃশ্যমানতা (Visibility), স্পষ্টতা (Obtrusiveness) ও প্রবেশযোগ্যতার (Accessibility) সাথে সম্পর্কিত বলে মত দিয়েছেন।[৪] প্রবন্ধে মূল বিষয়ের সাইট যেহেতু লবণাক্ত এলাকায় সেহেতু মিঠা পানির দিঘি তৈরির সাথে অবশ্যই পানির একটি সম্পর্ক রয়েছে। প্রত্নস্থলের ধ্বংসাবশেষ, দৃশ্যমানতা ও ব্যবহার উপযোগিতা নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে প্রত্নতত্ত্ববিদরা একটা সার্ভে ডিজাইন তৈরি করে থাকেন। তবে *ফিল্ড সার্ভে মেথডোলজি* শুরু করার ক্ষেত্রে পূর্ব জ্ঞান বা প্রত্নস্থল নিয়ে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কী কী বিষয় বা প্রকাশনা রয়েছে তা যাচাই খুব গুরুত্বপূর্ণ।[৫] Kenneth L. Feder প্রস্তাবিত Folk-Archeology এর *মেথডলজিকে*ও আলোচ্য গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে।[৬] আলোচ্য গবেষণাটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে একটি মিশ্র পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। যেখানে আর্কাইভাল গবেষণার পাশাপাশি মাঠভিত্তিক সাইট জরিপ, সাইট সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও পার্শ্ববর্তী বয়স্ক ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার সংগ্রহ এবং ভৌগোলিক বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সাইটে নিহিত সাংস্কৃতিক বর্ণনাগুলোর ব্যাখ্যার জন্য গুণগত ও প্রাপ্ত তথ্য থেকে আবাদ, আধ্যাত্মিকতা, মানবিকতা, সামাজিক সংহতির মতো মূল বিষয়বস্তুগুলো চিহ্নিত করতে থিমেটিক বিশ্লেষণ অনুসরণ করা হবে। লোককথা ও কিংবদন্তিসমূহের নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হবে; যার মাধ্যমে অন্তর্নিহিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করা হবে।

গবেষণাটি প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক উভয় ধরনের তথ্যসংগ্রহের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

প্রাথমিক উৎস

১. ক্ষেত্র সমীক্ষা: খালাস খাঁর ঢিবি সরেজমিনে পরিদর্শন করে ইটের সাইজ, সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে মাজারের উচ্চতা, অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ নির্ণয়সহ প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্য প্রাথমিক উৎস হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

২. জরিপ: কলোনিয়াল আর্কাইভস, ব্রিটিশ লেখকদের রিপোর্ট ও গেজেটিয়ার প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

দ্বৈতীয়িক উৎস

দ্বৈতীয়িক উৎসের মধ্যে থাকবে সুন্দরবন ও তৎসংলগ্ন এলাকা নিয়ে প্রকাশিত বই, প্রবন্ধ ও জরিপ প্রতিবেদন। প্রাসঙ্গিক সাক্ষাৎকারের পাশাপাশি এই অঞ্চল নিয়ে সম্পাদিত এমফিল ও পিএইচডি অভিসন্দর্ভ দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে পরিগণিত হবে।

প্রকাশনা পর্যালোচনা

কোনো বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে হলে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পূর্বজ্ঞান যাচাই করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলায় ইসলাম প্রচারে মূলধারার সুফি-সাধকদের ভূমিকা নিয়ে গবেষণা হলেও এমন অনেক চরিত্র রয়েছে যাদের নিয়ে অনুসন্ধানের অবকাশ রয়েছে। তেমনি এক চরিত্র খালাস খাঁ। যাকে নিয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও গবেষকের বিবরণীতে অল্পবিস্তর কাজ হলেও এ সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ গবেষণার অভাব রয়েছে। সুন্দরবন ও সন্নিহিত এলাকার ইতিহাস জানার সবচেয়ে আকর গ্রন্থ সতীশচন্দ্র মিত্রের (১৯১৪) *যশোহর-খুলনার ইতিহাস*। এই গ্রন্থে খান জাহানের কার্যবাহিনীর আলোচনায় শিষ্য বুড়া খাঁর

রাজ্যশাসন, জমিপত্তন ও ধর্ম প্রচারসংক্রান্ত আলোচনা বিবৃত হয়েছে। মিত্রের গ্রন্থে খালাস খাঁর দিঘি ও মাজারের বর্ণনা রয়েছে। মাজারের অবস্থান প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, দিঘির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি ইটে গাঁথা মঞ্চে কালীর থান আছে এবং তাহার পাশে খালাস খাঁ পিরের আস্তানা।[৭]

মুহাম্মদ আব্দুর রহিমের *Social and Cultural History of Bengal* বইটি বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস নির্মাণের ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাকর্ম। বইটি বাংলার মুসলমানদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক মিথস্ক্রিয়াকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে। গ্রন্থটিতে বাংলাদেশে যেসব পির ও সুফি-সাধকদের মাজার রয়েছে এমন ২২টি জেলার পিরদের ব্যাপারে সারণির মাধ্যমে তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। এই সারণিতে ষোড়শ শতাব্দীতে যশোরের অন্তর্ভুক্ত বেদকাশিতে খালাশ খান নামে একজন পিরের মাজারের উল্লেখ রয়েছে।

সুন্দরবন আবাদ ও এ সংক্রান্ত গবেষণায় এ. এফ. এম. আব্দুল জলীলের *সুন্দরবনের ইতিহাস* একটি অনন্য গ্রন্থ। গ্রন্থকার তাঁর গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায়ে যশোর জেলার পির-দরবেশ শীর্ষক অধ্যায়ে পির বোরহান খাঁ বা বুড়ো খাঁর প্রসঙ্গ অবতারণা করেছেন। তবে খালাস খাঁর প্রসঙ্গে তিনি সতীশ মিত্রের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন। সতীশ মিত্র খালাস খাঁকে কালী খালাস খাঁ বলায় আব্দুল জলীল সে বিষয়ে বিরুদ্ধাচরণ করেন। তবে খালাস খাঁর দিঘি ও তাঁর ধর্ম প্রচারের দিকটি তিনি তুলে ধরেছেন।[৮] যশোর-খুলনা নিয়ে লিখিত সব থেকে আদিগ্রন্থ *A Report on the District of Jessore: Its Antiquities, Its History and Its Commerce* এর রচয়িতা বৃহত্তর যশোরের ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর James Westland তাঁর জরিপ প্রতিবেদনে খান জাহান আলীর শিষ্যদের মধ্যে সুন্দরবন আবাদে বুড়া খাঁ ও ফতেহ খাঁর প্রসঙ্গ এনে মসজিদ, দিঘি, খানকা ও কাচারির বর্ণনা দিয়েছেন। তবে ওয়েস্ট ল্যান্ডের বর্ণনায় খালাস খাঁর প্রসঙ্গ আসেনি।[৯] টনি কে স্টুয়ার্টের বই *Witness to Marvels: Sufism and Literary Imagination* বাংলা সাহিত্য ও সুফিবাদের সংমিশ্রণ নিয়ে একটি অমূল্য গবেষণা যেখানে ষোড়শ শতাব্দী থেকে বাংলায় প্রচলিত পিরকথা নামক সুফি প্রভাবিত রোমান্টিক কাহিনির একটি বিশেষ ধারার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে বাংলা ভাষাভাষী এলাকায় ইসলাম কীভাবে স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে আত্মীকরণ করে একটি স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করে সেটি তুলে ধরা হয়েছে। গ্রন্থটিতে মানিক পির, বড় খান গাজী, বন বিবি, ওলা বিবি ও সত্যপিরের কাহিনি বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে।[১০] তবে খান জাহান বা তা অনুচরদের নিয়ে আলোচনা গ্রন্থে স্থান পায়নি। *Forest of Tigers: People, Politics and Environment in the Sundarbans* বইটি Annu Jalais এর একটি নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক কাজ; যেখানে সুন্দরবনের বাঘ ও স্থানীয় মানুষের সম্পর্ক, পরিবেশ বনাম রাজনীতি ও বাঘের আক্রমণে মৃত ব্যক্তিদের পরিবারের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি উঠে এসেছে। যদিও সুফিবাদ নিয়ে বইটিতে সরাসরি আলোচনা স্থান পায়নি। তবে স্থানীয় বিশ্বাস, লোকায়ত ধর্মচর্চা ও দেবদেবীর প্রতিকৃতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে লোকবিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতা কীভাবে সুন্দরবনে বাসরত মানুষের জীবনে মিশে আছে তা তুলে ধরা হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এখানে আধ্যাত্মিক সংস্কৃতিতে সুফিবাদের কিছুটা ছাপ পাওয়া যায়।

কাবেদুল ইসলাম *খুলনা জেলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি* গ্রন্থে খান জাহান ও প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে আলোচনা করলেও বুড়া খাঁ ও খালাস খাঁ সম্পর্কে আলোচনা তাঁর গবেষণায় স্থান পায়নি। মুহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম (২০১৫) তাঁর *সাতক্ষীরা জেলায় ইসলাম* গ্রন্থে 'আমাদি মসজিদকুড়' শীর্ষক অধ্যায়ে খান জাহান আলীর সহচর বোরহান খাঁ ও ফতে খাঁর সুন্দরবন আবাদ, ইসলাম প্রচার ও জনহিতকর কাজ সম্পর্কে খুব সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা এসেছে। পাশাপাশি তিনি খালাস খাঁর সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। *প্রত্নতত্ত্বসূত্রের আলোকে বৃহত্তর খুলনা জেলার মধ্যযুগের সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবন (১২০৪-১৫৩৮খ্রি)* এই শিরোনামে গবেষক একরাম উদ্দীন পিএইচডি করেছেন। তাঁর অভিসন্দর্ভে খালাস খাঁ সংক্রান্ত আলোচনায় মাজারের অবস্থান, উচ্চতা ও মাজার সংলগ্ন দিঘির বর্ণনার বাইরে তেমন উল্লেখযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় না। সুন্দরবন গবেষণা ও প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধানে সর্বশেষ সংযোজন ইসমে আজম ঋজুর *সুন্দরবননামা* গ্রন্থ। লেখক ১২ বছর ধরে ওয়াইল্ড টিমের সাথে সুন্দরবন সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ শেষে অসংখ্য প্রত্নস্থানের সন্ধান পেয়েছেন। খালাস খাঁ সম্পর্কে এ. এফ. এম আব্দুল জলিলের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি লিখেছেন, "তুর্ক আফগান আমলে খালেস খাঁ নামে এক ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি এখানে একটি বিরাট দিঘি খনন করেন। তিনি ইসলাম প্রচারক ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে।"[১১] গবেষক সুন্দরবনের মধ্যে মানব বসতির সন্ধান, বিলুপ্তপ্রায় গন্ডারের কঙ্কাল আবিষ্কার, সুন্দরবনে লবণ শিল্পের বিকাশ প্রভৃতি বিষয়ের সন্ধান পেয়েছেন। উপরোল্লিখিত গ্রন্থগুলোতে খালাস খাঁর দিঘি ও ঢিবির অবস্থান নিয়ে অল্পবিস্তার আলোচনা উঠে আসলেও জনশ্রুতি ও সুফিবাদের তাত্ত্বিক কাঠামোর আলোকে ইসলাম প্রচারে খালাস খাঁর অবদানকে কেউ তুলে ধরেনি।

তাত্ত্বিক কাঠামো

মাজার ও দিঘি ব্যতীত খালাস খাঁর ইসলাম প্রচার ও সামাজিক-আধ্যাত্মিক কাজ সম্পর্কে জানতে হলে মিথ বা জনশ্রুতির ওপর নির্ভরতার বিকল্প নেই। এতৎ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে সুফিবাদের তাত্ত্বিক কাঠামোর আলোকে খালাস খাঁর কার্যাবলি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। বাংলায় ইসলাম প্রচারের সাফল্য সম্পর্কিত রিচার্ড এম ইটনের *The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204-1760* একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কর্ম। এই বইয়ে ইটন তাত্ত্বিক কাঠামোর মাধ্যমে মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস ব্যাখ্যা করেছেন।[১২] বাংলায় ইসলাম প্রচার সম্পর্কে ইটনের ব্যাখ্যায় গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যসমূহ ছিল: গঙ্গার প্রবাহ কমে যাওয়ায় ষোড়শ শতকের শেষ দিকে বাংলার নিম্নভূমিতে পরিবেশগত পরিবর্তন হওয়ায় পশ্চিমাঞ্চলের জমি অনুর্বর হয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে ম্যালেরিয়া এই অঞ্চলে মহামারি আকার ধারণ করে। এই তুলনায় নবগঠিত বদ্বীপ অধ্যুষিত পূর্ব বাংলায় উর্বর জমির আধিক্য দেখা দেয়। পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পূর্ববঙ্গে নবগঠিত অঞ্চলে বসতি স্থাপন করার ব্যাপক প্রবণতা লক্ষ করা যায়। সুফি-পিরদের সরাসরি দিক নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে পূর্ব বাংলার দক্ষিণাঞ্চলের নব গঠিত ভূমির জঙ্গল পরিষ্কার করে মুসলমানরা বসতি স্থাপন শুরু করে। বসতিগুলো গড়ে ওঠার কারণ বর্ণনায় ইটন খান জাহান আলীর নেতৃত্ব ও পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা মুসলমান বসতির নজির হাজির করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইটনের বর্ণনা এমন:

> Khan Jahan was clearly an effective leader, since superior organizational skills and abundant manpower were necessary for transforming the region's formerly thick jungle into rice fields: the land had to be embanked along streams in order to keep the salt water out, the forest had to be cleared, tanks had to be dug for water supply and storage and huts had to be built for the workers. When these tasks were accomplished, rice had to be planted immediately, lest a reed jungle soon return. These were all arduous operations, made more difficult by the ever-present dangers of tigers and fevers. [১৩]

রিচার্ড ইটন আরও দেখিয়েছেন, সুফি-সাধকরা ন্যায়বিচার, ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা, সমতার বার্তা প্রচার করে সমাজের নিপীড়িত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইসলামের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। এর ফলে বাঙালি কৃষক ও নিম্নবর্গের মানুষের মাঝে ইসলামের প্রতি আগ্রহ জন্মে।[১৪] ইটন বলতে চেয়েছেন যে, সুফি-সাধকরা একই সাথে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বাণিজ্যিক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা, কৃষি ও ব্যাবসায়িক কার্যক্রমে সহায়তা করা, পণ্য পরিবহণে রাস্তাঘাট তৈরি প্রভৃতি কার্যক্রমে সহায়তা করে যেটা অনেককে ইসলামে রূপান্তরিত হতে সাহায্য করে।[১৫] ইটনের বক্তব্যের তাত্ত্বিক কাঠামোর সাথে খালাস খাঁকে তুলনা করা যায়। যেখানে ইটনের বক্তব্যের সাথে খালাস খাঁর কর্মকাণ্ড মেলানো সহজ হয়। খান জাহান, বুড়া খাঁ বা অন্যান্য সুফি সাধকদের মত খালাস খাঁও দক্ষিণ বাংলার নবগঠিত পলিমিশ্রিত উর্বর অঞ্চলের ঘন জঙ্গল পরিষ্কার করে বসতি প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি বাঁধ নির্মাণ, পানীয় জলের অসুবিধা দূরীকরণের লক্ষ্যে দিঘি খননের মতো উদ্যোগ নিয়েছিলেন। অর্থনৈতিক, সামাজিক ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় কাজ করেছিলেন।

বাংলায় ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণে এনামুল হকের *এ হিস্ট্রি অফ সুফিজম ইন বেঙ্গল* অন্যতম গ্রন্থ। এই গ্রন্থে লেখক সুফিজমের যেসব তাত্ত্বিক কাঠামো তৈরি করেছেন তার মধ্যে 'Theory of Love' অন্যতম। এই তত্ত্বের মূল কথা প্রভু ও মানুষের মধ্যে হৃদ্যতার সম্পর্ক স্থাপন। সাদাসিধে আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপন ও খোদার প্রতি অতি ভক্তির কারণে সাধারণ মানুষের কাছে আকর্ষণের জায়গা তৈরি করতে পেরেছিলেন সুফিরা। অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ করে তোলা ও গূঢ় বিষয়ের রহস্যের জট খুলতে পারার মতো অলৌকিক ক্ষমতার কারণে মানুষের মনে জায়গা করে নিয়েছিলেন সুফিরা।[১৬] সুফিরা যখন এ অঞ্চলে আগমন করেন তখন এখানকার মানুষ কুসংস্কারে লিপ্ত ছিল। সুফিদের অলৌকিক ক্ষমতার কারণে মানুষ তাদেরকে 'সুপার হিউম্যান' মনে করত। এমন এক সময় ইসলামের সাম্যের বাণী প্রচারের মাধ্যমে সুফিরা হিন্দুসমাজের ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।[১৭] খালাস খাঁ যখন সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকায় ইসলাম প্রচারে কাজ করেছিলেন তখন এখানে হিন্দু অধ্যুষিত ছিল সেটা এখানকার প্রাপ্ত বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি থেকে প্রতীয়মান হয়।

বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস (১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত) গ্রন্থে ইসলাম প্রচারে সুফিদের প্রভাব সম্পর্কে আব্দুল করিম মন্তব্য করেন যে, জনসাধারণকে শিক্ষিত করার ক্ষেত্রে অনেক সুফি মনোযোগ দিতেন। মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি খানকা ব্যবস্থাপনায় গুরুত্ব দিতেন অনেকে। খানকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকত– চিল্লাখানা, সিজদাহগাহ, নামাজের জায়গা প্রভৃতি। সুফিদের খানকাতে তার অনুসারীরা কাপড় ধোয়া, পানির ব্যবস্থা, ইফতার ও সেহরির ব্যবস্থা করত। বাংলার সুফিবাদ এমন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল যে, সুফিবাদের মধ্যে নিত্যনতুন সিলসিলার উদ্ভব শুরু হয়।[১৮] সুফিদের অনাথ আশ্রম ও খানকা গুলো ছিল দারিদ্র্য-পীড়িত , সন্ন্যাসী ও ভবঘুরেদের জন্য উন্মুক্ত। জনগণ এসব কারণে তাদের প্রতি এমনই অনুরক্ত হয়ে পড়েছিল যে দলে দলে সুফিবাদের মতবাদ গ্রহণ করতে থাকে।[১৯] আব্দুল করিমের উপর্যুক্ত তত্ত্বের আলোকে খালাস খাঁকে বিচার করা যেতে পারে। খালাস খাঁর ঢিবিতে মাজার, মসজিদ ও পূর্বপাশে দিঘির অস্তিত্বে যার প্রমাণ মেলে।

সুন্দরবন আবাদ ও জনকল্যাণে খালাস খাঁ

মতদ্বৈততা থাকলেও এ বিষয়ে অনেকেই একমত যে, খালাস খাঁ খান জাহানের শিষ্যদের মধ্যে একজন। খান জাহানের বাংলায় আগমনের সঠিক দিনক্ষণ জানা যায় না। তবে তিনি গৌড়ের সুলতান জালালুদ্দিন মুহাম্মদ শাহের সময় (১৪১৮-১৪৩২) বাংলায় আগমন করেন বলে ধরে নেওয়া হয়। দক্ষিণবঙ্গে আগমন করে খান জাহান যেসব জায়গায় আস্তানা নির্মাণ করেন তার মধ্যে ভৈরব নদের পাশে বারোবাজার অন্যতম।[২০] খান জাহান আলী যে সুন্দরবন আবাদ করে ইসলাম প্রচারের পাশাপাশি জনহিতকর বিভিন্ন কাজ করেছেন সে সম্পর্কে ওয়েস্টল্যান্ডের-ই প্রায় সমসাময়িক যশোরের বাঙালি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবুরাম সংকর সেন ঝিনাইদহ, মাগুরা, বাগেরহাট ও সুন্দরবন মহকুমা পরিদর্শন করে বৃহত্তর যশোর জেলার কৃষিসংক্রান্ত যে পরিসংখ্যান প্রস্তুত করেছিলেন সেখানে তিনি উল্লেখ করেন,

> South of this (the Baleshwar near Kachua) lies the great Sundabun country, in which the work of reclamation has gone on from the 15th century with a slow but steady pace, and where human energy, in a continuous fight with jungle, has driven the forest line downwards, until at the present day nearly half of what was formerly an unproductive and impenetrable woody waste has been converted into smiling gardens of graceful palm and immense field of waving rice. The earliest reclaimer of whom we have any trace was Keswar khan, more widely known as Alg Khan Jehan Ali, who flourished in the days when Nazir Shah was independent king of Bengal (1426-1457 A.D) and who died when Babek shah has succeeded to the throne of his father (1458 A.D).[২১]

Hunter সম্পাদিত অখণ্ড বঙ্গের জেলাসমূহের সিরিজ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে (নদীয়া যশোহর) খান জাহান সম্পর্কে বলেন, "This Khan Jahan was one of the

earliest reclaimers of the Sundarbans and it is noticeable that even at the present day cultivation has but little advanced beyond his settlements near Bagerhat and at Amad.,"[২২] সুতরাং, প্রাচীন যুগের শেষে দীর্ঘ বিরতির পরে মানব বসতিশূন্য সুন্দরবন অঞ্চল যেটা রামশংকর সেনের ভাষায় 'An unproductive and impenetrable woody state' ছিল সেই জংলাকীর্ণ অঞ্চল পরিষ্কার করে ইসলাম প্রচার ও জনহিতকর কাজের উদ্যোগ নেন খান জাহান। এজন্য খান জাহানকে শ্রী সেনের ভাষায় "The earliest reclaimer" এবং হান্টারের মতানুযায়ী "One of the earliest reclaimers of the Sundarbans" বলে নিঃসন্দেহে অভিহিত করা যায়।[২৩] বারোবাজারে ইসলাম প্রচার সম্পন্ন শেষে খান জাহানের শিষ্যরা মুরলি-কসবা থেকে ভাগ হয়ে দুদিকে গমন করে। একদল পয়গ্রাম কসবা যায় ভৈরব কূল অনুসরণ করে। অন্যদল যশোরের কপোতাক্ষ নদের অনুকরণে বেদকাশি পর্যন্ত পৌঁছায়।[২৪]

কপোতাক্ষের তীর ধরে সাতক্ষীরা ও খুলনা জেলার দক্ষিণে সুদূর সুন্দরবন পর্যন্ত যে দল যায় তাঁর নেতৃত্বে ছিলেন বুড়ো খাঁ ও তাঁর পুত্র ফতেহ খাঁ।[২৫] পিতা-পুত্র আমাদিতে এসে মসজিদ ও কাচারি নির্মাণ করেন। রাস্তা তৈরি করতে করতে এই বাহিনী সুন্দরবনের বেদকাশি পর্যন্ত যায়। বর্তমানেও এই রাস্তার অস্তিত্ব রয়েছে। এই রাস্তা যশোর, খানপুর, কেশবপুর, বিদ্যানন্দকাটি হয়ে মাগুরা ঘোনা, আটারই, জেয়ালা, বারুইহাটির পূর্ব ধার, তালা চাপান ঘাট, খলিলনগর, গঙ্গারামপুর, ঘোষনগর, কপিলমুণি, রামনাথপুর, গদাইপুর ও মঠবাড়ি হয়ে পাইকগাছায় মিশেছে। সেখান থেকে শিবসা নদী পার হয়ে এই রাস্তা লক্ষীখোলা, গজালিয়া, আলেমতলা দিয়ে মসজিদকুড়ে এসে মিলেছে; যেখানে খান জাহানে অনুচর বুড়াখাঁর কীর্তি বর্তমান। মসজিদকুড় হতে এই রাস্তা আমাদি হয়ে গভীর অরণ্যের মাঝ দিয়ে বেদকাশিতে গিয়ে সমাপ্ত হয়েছে[২৬]; যেখানে খালাস খাঁর মাজার ও দিঘির অস্তিত্ব রয়েছে। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, আবাদকৃত অঞ্চলের জনগণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য এই রাস্তা তৈরি করা হয়। আর রাস্তার সাথে অর্থনীতি-বাণিজ্য, কৃষি সবকিছুর যোগসূত্র বিদ্যমান।

এই বেতকাশিতেই আস্তানা নির্মাণ করে নানাবিধ ধর্মীয় ও জনকল্যাণমুখী কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছিলেন খালাস খাঁ। বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক H. Blochmann বুড়া খাঁর মসজিদকুড় মসজিদ ও সুন্দরবন আবাদ নিয়ে মন্তব্য করেছেন,

> His clearings at the Kabadak near Amadi must have been temporary; at least the comparatively recent discovery of Khan Jahan's Mosque there gave rise to the name of Masjidkur. South of Amadi, also, due east of Iswaripur the 24 Parganas, the maps mark the sites of ruins and attempts at colonization; and, on the whole, in Jessore District, the jungle extends much more to the north than in the 24 Parganas.[২৭]

H. Blochmann এর গ্রন্থে যে কাবাদাক (কপোতাক্ষ) নদের কথা বলা হয়েছে; যার তীরে মসজিদকুড় মসজিদ অবস্থিত। এর আরও দক্ষিণে সুন্দরবন আবাদের প্রসঙ্গে যে

স্থানটি বর্ণনা এসেছে সেটির অবস্থান: আমাদির দক্ষিণে ও ইশ্বরীপুরের পূর্বদিকে যেখানে ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থান ও জনবসতি গড়ে তোলার নিদর্শন রয়েছে। সম্ভবত এই জায়গাটি সুন্দরবনের বেদকাশি অঞ্চল যেখানে খালাস খাঁর মাজার ও কার্য এলাকা ছিল। কারণ খালাস খাঁর মাজার আমাদির দক্ষিণ দিকে। খালাস খাঁর পরিচয় সম্পর্কে এ. এফ. এম আব্দুল জলীল লিখেছেন,

> বুড়ো খাঁর জনৈক সহকর্মীর নাম ছিল খালাস খাঁ। তিনি এদেশে কালাস খাঁ নামে পরিচিত। তিনি বেদকাশিতে একটা প্রকাণ্ড দিঘি খনন করিয়া লোকের জলকষ্ট নিবারণ করেছিলেন। সুন্দরবন অঞ্চলে পানীয় জলের অভাব অত্যধিক। সর্বত্র লবণাক্ত জল দূরদূরান্ত হইতে অসংখ্য লোক এই বেদকাশির দিঘির জল লইয়া সেবন করিয়া থাকে। আজও বহু হাটবাজারে গ্রীষ্মকালে এই জল বিক্রয় করিয়া বহু দরিদ্র লোক জীবনধারণ করে। খননকারীর নামানুসারে এই দিঘীর নাম হইয়াছিল 'খালাস খাঁ' দিঘি।[২৮]

যশোহর-খুলনার ইতিহাস গ্রন্থ রচয়িতা সতীশ চন্দ্র মিত্রের ভাষ্য, 'সম্ভবত পাঠান আমলে খালাস খাঁ নামক জনৈক সাধু বা পীর এখানে আসিয়া ধর্ম প্রচার করেন এবং দিঘী তিনি খনন করেন।'[২৯] তবে কেউ কেউ খালাস খাঁকে খান জাহান আলী বা বুড়ো খাঁর অনুচর বা শিষ্য বলতে রাজি নয়। যাদের মধ্যে অন্যতম গবেষক আব্দুল মান্নান তালিব। তিনি খালাস খাঁকে সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকায় প্রথম ইসলাম প্রচারক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর মতে, খালাস খাঁ ইসলাম প্রচারের কেন্দ্ররূপে কপোতাক্ষ নদের পূর্ব তীরে বেদকাশি নামক স্থানকে নির্বাচন করেছিলেন। সেসময় যশোর জেলা ও এই এলাকায় ইসলামের দাওয়াত সেভাবে পৌঁছায়নি। খালাস খাঁ-ই এই এলাকায় প্রথম ইসলাম প্রচারক।[৩০]

মেহেরপুরের পির মেহের উদ্দিন, মাগুরার পির জয়নুদ্দীন, সুজন শাহ গ্রামের পির সুজন শাহের মতো বেদকাশির খালাস খাঁও বুড়া খাঁর অনুচর ছিলেন বলে জানা যায়।[৩১] সতীশ চন্দ্র মিত্রের বিবৃতিতেও একই আভাস পাওয়া যায়। খালাস খাঁকে তিনি বুড়া খাঁর অনুচর বলার পাশাপাশি এমন আরও কয়েকজনকে বুড়া খাঁর শিষ্য বলে মনে করেন, যারা বিদ্যানন্দকাটি থেকে পশ্চিম দিকে এসে কপোতাক্ষের কূল ধরে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। সতীশ চন্দ্র মিত্র ত্রিমোহানীর কাছে গোপালপুরে বুড়া খাঁর অজ্ঞাত একজন অনুচরের ধারণা করেছেন যার মাজার পাওয়া যায় না। মিত্রের ধারণা: কপোতাক্ষের ভাটিতে মেহেরপুরের মেহের উদ্দিন, মাগুরা গ্রামের পির জয়ন্তী (জয়েন উদ্দিন), সুজনশা গ্রামের সুজন শাহও খালাস খাঁর ন্যায় বুড়া খাঁ তথা খান জাহানের অনুচর ছিলেন।[৩২] উল্লিখিত ৪ জনের প্রত্যেকেই কপোতাক্ষের ভাটিতে মসজিদ, খানকা ও দিঘি নির্মাণ করেছিলেন। মোগল আমলে রাজা প্রতাপাদিত্য এই বেদকাশিতেই দুর্গ তৈরি করেছিলেন বলে জানা যায়। সমৃদ্ধ বসতি না থাকলে মহারাজ বসন্তরায় এখানে উতকলেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করতেন না। আর খালাস খাঁ পরবর্তী সময়েই প্রতাপাদিত্য এই অঞ্চলে আসেন।[৩৩] জেমস ওয়েস্টল্যান্ডের ভাষ্য উপরিউক্ত বর্ণনাকে আরও প্রামাণিক করে তোলে। এ সংক্রান্ত ওয়েস্টল্যান্ডের বিবৃতি এরকম:

> Another testimony regarding Khanja Ali's position I find in the history I am about to narrate of Raja Pratapaditya. He came to the country a century later, and it is stated that the land had, before him, been occupied by a Mussulman ruler of the Khan race.[৩৪]

সুতরাং, প্রতাপাদিত্যের বেদকাশিতে আগমনের শত বছর পূর্বে ওয়েস্ট ল্যান্ড খান জাহানের যে অনুচরের প্রসঙ্গে ধারণা করেছেন তিনিই সম্ভবত এই খালাস খাঁ।

খালাস খাঁর দিঘি

খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার উত্তর বেদকাশি ইউনিয়নের বেদকাশি মৌজার দিঘিরপাড় গ্রামে দিঘিটির অবস্থান। কয়রা উপজেলার উত্তর বেদকাশি ইউনিয়ন পরিষদ থেকে পশ্চিম দিকে খালাস খাঁর দিঘিটির দূরত্ব ২ কিলোমিটার। এটি বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের অধীন। দিঘির উপস্থিতি প্রমাণ করে যে জঙ্গল পরিষ্কার করে বসতি নির্মাণের পাশাপাশি পানীয় জলের অসুবিধা লাঘবে খালাস খাঁ দিঘিটি খনন করেছিলেন। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের বর্ণনামতে পনেরো শতকের দিকে খালাস খাঁ কর্তৃক দিঘিটি খনন করা হয়েছে।[৩৫] এস এ সার্ভে ম্যাপে ৫০৪০নং প্লটে খালাস খাঁ দিঘির চিত্র রয়েছে।

চিত্র নং-০১ মানচিত্রে ৫০৪০ নং প্লটে খালাস খাঁর দিঘি অবস্থিত। সোর্স: এস. এ সার্ভে ম্যাপ। জেলা খুলনা, থানা: পাইকগাছা, মৌজা: উত্তর বেদকাশি নং ২৩৫, সিট নং ০১, লট নং ২২১।

মুসলমান শাসক বা কোনো সুফিরা দিঘি খনন করলে সাধারণত পূর্ব পশ্চিমে দিককে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। হিন্দু শাসকরা দিঘি করার ক্ষেত্রে উত্তর-দক্ষিণকে প্রাধান্য দেয়। খান জাহান ও তাঁর শিষ্যবর্গের খননকৃত সকল দিঘিই পূর্ব-পশ্চিমে অবস্থিত। খালাস

খাঁর দিঘিটিও পূর্ব-পশ্চিমে অবস্থিত। সতীশ চন্দ্র মিত্রের মতে, দিঘির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে ৭০০ ও ৪০০ হাতের বেশি। এটি সুন্দরবনের ২১১ নং লাটে অবস্থিত।[৩৬] অন্যদিকে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের জরিপে বলা হয়েছে দিঘিটির পরিধি ৮০ বিঘা। তবে পাড়সহ ১২০ বিঘা। যদিও দিঘির দৈর্ঘ্য ৩১০ মিটার, প্রস্থ ১১৫ মিটার। গভীরতা ১০ - ১৫ ফুট। দিঘিটির উত্তর-পশ্চিম কোনায় রয়েছে একটি কলেজিয়েট স্কুল ও বসতবাড়ি। পূর্বেও বসতবাড়ি ও মার্কেট আর দক্ষিণ-পশ্চিম কোনায় একটি জামে মসজিদ অবস্থিত। খালাস খাঁর দিঘির দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় এক থেকে দেড় কিলোমিটার দূরত্বে কপোতাক্ষ নদ এবং পূর্বে শাকবাড়িয়া নদী ও বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবন। এই দিঘি থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরত্বে নোনা দিঘি নামে একটা দিঘি ছিল। যেটি বর্তমানে স্থানীয় মানুষ খণ্ড খণ্ড করে ঘের ও বসতি তৈরি করে নিয়েছে।' [৩৭]

দিঘি সম্পর্কে স্থানীয় মানুষের বয়ানে যা জানা যায় সেটি আলোচনা করা জরুরি। কেউ কেউ মনে করেন, এক রাতেই খালাস খাঁর অনুগত জিনেরাই এই দিঘি খনন করে দিয়ে যায়। স্থানীয় মানুষের জীবিকার প্রয়োজনে দিঘির পানি হাটে হাটে বিক্রি করত যেটা আব্দুল জলীল ও অন্যান্য অনেক লেখকের গ্রন্থে উঠে এসেছে। নদীবাহিত এলাকা হওয়ায় সুপেয় পানির সংকট মেটাতে বহু দূর হতে অসংখ্য লোক এই দিঘির পানি নিতে আসত। গবেষক আব্দুল জলীল যখন এ এলাকায় আসেন সেসময়ে এই পানি বিক্রয় করতে দেখেছেন।[৩৮] দিঘির ৩ গ্লাস পানি দু আনায় বিক্রি হতো। পার্শ্ববর্তী বড়দল, গাবুরা ও নোয়াবেকির হাটে দিঘির পানি বিক্রির জন্য নিয়ে যাওয়া হতো। দিঘির পানি পান করলে পেট ব্যথা, গ্যাস্ট্রিকের মতো পেটের রোগ ভালো হয়ে যায় বলে স্থানীয়দের বিশ্বাস ছিল। দিঘির চারকোনায় একসময় লাল টকটকে, নীলাভ ও লালচে হলুদ–এই তিন রকমের পানি ছিল। স্থানীয় জনৈক বীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল মনে করেন, গরু ছাগলের বাচ্চা প্রস্রাবের সময় স্থানীয় মানুষ দিঘির নামে মানত করলে দ্রুত খালাস (ডেলিভারি) হয়ে যেত এজন্য দিঘির নাম খালাস খাঁ দিঘি। দিঘিকে কেন্দ্র করে বর্তমানে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি না হলেও দিঘির দক্ষিণ-পশ্চিম কোনায় প্রতিবছর চৈত্র মাসে কালী পূজা হয়ে থাকে।[৩৯] হাতুড়ের বার্ট, মূর্তি, পাথর, থালা এগুলো পুকুরের পাওয়া যেত বলে স্থানীয় মানুষ এখনো স্মরণ করেন।[৪০] লোকমুখে শোনা যায় যে, কারও বাড়িতে বিবাহ বা বড় কোনো অনুষ্ঠান হলে দিঘির দক্ষিণ-পশ্চিম পার্শস্থ কালীর থানে এসে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা বিভিন্ন জিনিস চাইত। এমনকি অনুষ্ঠানে প্লেট ব্যবহার করতে দিঘির শরণাপন্ন হতো। দিঘি থেকে তখন থালা বাসন উপরে উঠে আসত। বিয়ের কাজ সেরে আবার বাসনগুলো দিঘির পাশে রাখলে এমনি এমনি দিঘি সেগুলো নিয়ে নিত।[৪১] স্থানীয় লোককবি এবাদুল্লাহর 'কবির নিবাস' কবিতায় এই দিঘির বর্ণনা উঠে এসেছে এভাবে।

কত প্রাচীন কীর্তি সেথা ওই খানে মোর ঘরখানা
খান জাহানের দীঘি আছে এক পাড়ে তার বীর সাজে,
রক্ত রাঙা মিষ্ট মধুর স্বচ্ছ সলিল তার মাঝে,
চারপাশে তার কুঞ্জ কানন পুঞ্জ গাছের আমদানী
তার উপরে দোয়েল নাচে, কোয়েল ডাকে দিনযামী

স্বর্গ কানন দেখতে এমন দীঘিকার এই বনপুরী।
প্রাচীন যুগের দালান কোঠা, কচু রায়ের রাজধানী
বসিয়া গেছে মাটির পরে ওইখানে মোর ঘরখানি।[৪২]

চিত্র নং-০২ খালাস খাঁর দিঘি। লোকেশনঃ উত্তর বেদকাশি, কয়রা খুলনা। মানচিত্রে ৫০৪০ প্লটে অবস্থিত। ছবিঃ প্রাবন্ধিক। সংগ্রহের তারিখঃ ৫ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রি.

চিত্রঃ ০৩. খালাস খাঁর দিঘিতে প্রাপ্ত ঢাকনা ও পাত্র। ছবিঃ ইসমে আজম, *সুন্দরবনামা* (রংপুরঃ আইডিয়া প্রকাশন,২০২৫), ৩৯০।

খালাস খাঁর ঢিবি প্রত্নস্থল

খালাস খাঁর ঢিবিটি সুন্দরবনের খুলনা রেঞ্জের কপোতাক্ষ নদ থেকে পূর্বে প্রায় এক কিলোমিটার ও দক্ষিণে ১.৫ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। পূর্বে শাকবাড়িয়া নদী থেকে ঢিবিটির দূরত্ব প্রায় ৩ কিলোমিটার। দিঘি থেকে ঢিবিটির দূরত্ব ৩০ ফুট। ঢিবি থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের কালীর থানের দূরত্ব আনুমানিক ৩০০ ফুট। কালীর থানে স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায় এখনো মানত ও ধর্মীয় কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ঢিবির উচ্চতা ১০ ফুট, অক্ষাংশ ২২. ৩০৩২৫১ এবং দ্রাঘিমাংশ ৮৯.২৯৭৬৪৭।

ঢিবিটিতে মসজিদ ও মাজারের অস্তিত্ব রয়েছে। সে হিসেবে বলা যায়, খালাস খাঁ হিন্দু অধ্যুষিত এ অঞ্চলে কল্যাণধর্মী কাজ ও আধ্যাত্মিকতা চর্চার মাধ্যমে ইসলামে ধর্মান্তরিতকরণে কাজ করেছিলেন। বাংলাদেশের যেসব প্রধান প্রধান পির-দরবেশের মাজার আছে বলে স্থানীয়ভাবে বিশ্বাস করা হয় এমন ২২টি জেলার পির দরবেশের মাজারের মধ্যে বেদকাশির খালাস খাঁর মাজারও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।[৪৩] ঢিবিটির ওপর বাঁশ ও অন্যান্য গাছপালা থাকায় মাজার দৃশ্যমান না। তবে প্রচুর পুরাতন ইমারতের উপস্থিতি স্থাপনার সাক্ষ্য বহন করে। ঢিবিটির দক্ষিণ পাশে একটি মসজিদ আছে বলে প্রতীয়মান হয়। সরেজমিনে পরিদর্শনে মসজিদের 'ইউ' আকৃতির মিহরাব দৃষ্টিগোচর হয়েছে। মিহরাব থেকে দক্ষিণ দিকে একটা ইটের দেওয়াল চলে গেছে যেটা আনুমানিক ১০ হাত দীর্ঘ। মিহরাবের উত্তর দিকেও একটা সমরূপ দেওয়াল ধারণা করা যায়। মসজিদের পূর্ব দিকে সাধারণত দিঘি বা পুকুর থাকে। খালাস খাঁর মাজার সংলগ্ন মসজিদের পূর্ব পাশে বিদ্যমান দিঘিটিতে ২০২০ সালে আম্পান জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হয়ে লোনা পানি প্রবেশ করলে সুপেয় পানীয় জলের উদ্দেশ্যে দিঘিটির পানি নিষ্কাশন করা হয়। এসময় দিঘির পশ্চিম পাশে যেখানে মাজার অবস্থিত সেখানে ঘাটের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মাজারের পাশে মসজিদ ছিল আর অজুর সুবিধার্থে দিঘির সাথে ঘাট সংযুক্ত করা হয়েছিল। সতীশ মিত্র দিঘির দক্ষিণ পশ্চিম কোণে একটি ইটে গাঁথা মঞ্চে কালীর থানের যে পাশে খালাস খাঁ পিরের আস্তানা বলে ধারণা করেছিলেন এটাই সেই জায়গা।[৪৪] কালীর থানের পাশে দিঘি থাকার কারণে সতীশ মিত্র কালী খালাস খাঁ দিঘি বলে মন্তব্য করেছেন। তবে সতীশ মিত্রের ধারণা দিঘির পাশে যে কালীর থান সেটা মোগল আমলের বা প্রতাপাদিত্যের সময়ের।[৪৫] জনশ্রুতি আছে যে, রুহুল আমিন (র.) কয়রার বেদকাশিস্থ কাশির হাটখোলা দিয়ে অতিক্রমকালে পালকি থেকে নেমে 'কাশফ' করে জানান যে, এখানে একজন গুণী ব্যক্তির কবর আছে। এরপরে তিনি কবর জেয়ারত করেন।[৪৬] জোব্বা গায়ে দিয়ে ফকির ধরনের একজন ব্যক্তি খালাস খাঁর মাজারের পাশে ছিল কয়েকদিন।[৪৭] স্থানীয়দের ভাষ্যমতে, পিরের মাজার বিধায় অনেকে কবর জিয়ারত করতে আসে। খালাস খাঁর মাজারের ইটের দৈর্ঘ্য ১৮ সেন্টিমিটার, প্রস্থ ১৪ সেন্টিমিটার ও উচ্চতা ৫ সেন্টিমিটার। তবে মাজার সংলগ্ন স্থলে তিন ধরনের ইট ও টেরাকোটার ভাঙা অংশ পাওয়া গেলেও ইটের গায়ে কোনো নকশা পাওয়া যায় না। বুরহান খাঁর মাজার থেকে খালাস খাঁর মাজারের দূরত্ব দক্ষিণে ২৫ কিলোমিটার। দিঘি খনন থেকে অনুমান করা যায় যে, খালাস খাঁও পানীয় জলের অভাব দূরীকরণে খান জাহান আলীর মতো দিঘি খনন করে জনহিতকর কাজের মাধ্যমে সুন্দরবন অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে অবদান রেখেছিলেন। প্রাচীনকাল থেকে খালাস খাঁর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত এই অঞ্চল হিন্দু অধ্যুষিত ছিল বলে মনে করা হয়। প্রাচীনকালে এখানে চতুর্ভুজা, পরিমলা, চামুণ্ডা দেবীর পূজা করা হতো।[৪৮] বেদকাশির নিকটবর্তী যে আমাদি গ্রাম রয়েছে যেখানে বুড়া খাঁর অধিক্ষেত্র ছিল; সেখানে আধুনিককালে ভূগর্ভ হতে পরিমালা দেবীর মূর্তি উদ্ধার হিন্দু সভ্যতা চর্যার বিষয়টি প্রমাণ করে।[৪৯]

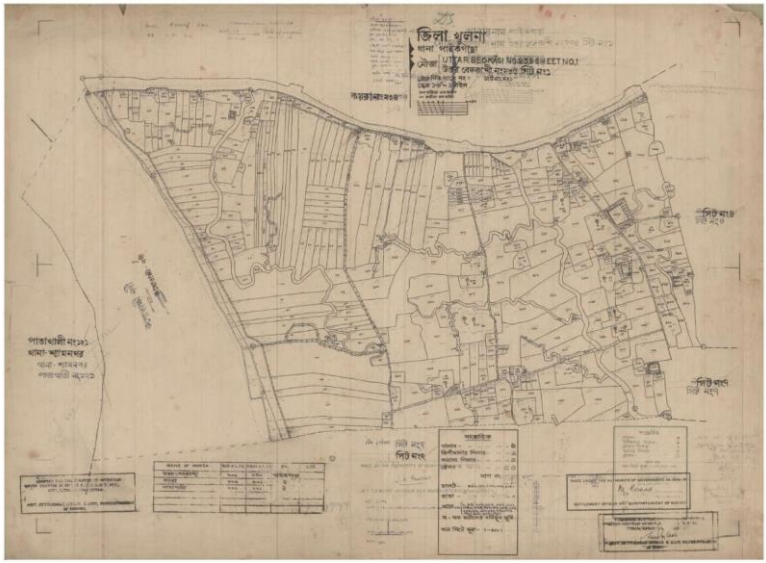

চিত্র নং০৪-খালাস খাঁর ঢিবি। সূত্রঃ এস এ জরিপ ম্যাপ। জেলা খুলনা, থানাঃ পাইকগাছা, মৌজা উত্তর বেদকাশি নং ২৩৫, সিট নং ০১, লট নং ২২১।

উপসংহার

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মাঠ সমীক্ষা, সতীশ মিত্রসহ বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ, ব্রিটিশ লেখকদের রিপোর্ট ও গেজেটিয়ার এবং স্থানীয় ল্যান্ড সার্ভে অফিস থেকে প্রাপ্ত ম্যাপ, খালাস খাঁর ঢিবিতে মাজার ও মসজিদের উপস্থিতি এবং মাজার সংলগ্ন দিঘির অবস্থান সুন্দরবনের এই প্রান্তিক জনপদে খালাস খাঁর অস্তিত্বের প্রমাণকে আরও জোরালো করে। খান জাহানের শিষ্যদের একটি দল যে যশোরের কপোতাক্ষ নদের কূল ধরে বেদকাশি পর্যন্ত পৌঁছান সে ব্যাপারে অনেক সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে।[৫০] বেশিরভাগ ঐতিহাসিকরা খালাস খাঁকে খান জাহানের শিষ্য বলে মনে করেছেন। কাছাকাছি সময় খান জাহান ও তাঁর শিষ্যদের ন্যায় দিঘি ও রাস্তা নির্মাণের মতো সমধর্মীয় কার্যাবলি সম্পাদন খালাস খাঁকে খানজাহানের সমসাময়িক ও অনুসারী বলার ক্ষেত্রে যুক্তিকে শক্তিশালী করে। ঢিবি সংলগ্ন স্থানীয় মানুষের লোককথা (Folk-archeology), দিঘি, রাস্তা ও বিদ্যমান নিদর্শন এবং সুফিবাদের তাত্ত্বিক কাঠামোর ভিত্তিতে খালাস খাঁকে নিঃসন্দেহে একজন ধর্মপ্রচারক বলা যায়। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার গভীর অরণ্যের ঘন জঙ্গল পরিষ্কার করে যিনি বসতি নির্মাণ ও জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণের যথাযথ ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং আধ্যাত্মিকতা চর্চার মাধ্যমে নবগঠিত অঞ্চলের জনগণের মাঝে ইসলামের বাণী পৌঁছে দিয়েছিলেন; জনশ্রুতি (মিথ) ও বর্তমান জনমানসে খালাস খাঁ চর্চার মাধ্যমে যার প্রমাণ পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র

১ আকবর আলি খান, *বাংলায় ইসলাম প্রচারে সাফল্য : একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ* (ঢাকা: প্রথমা, ২০১৯), ৫৫।
২ গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সুফি-সাধক* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮২), ৬৭-৬৯।
৩ Kenneth L. Feder et all, *Fields Methods in Archeology,* (London and New York: Routledge, 2016), 44.
৪ Kenneth L. Feder et all, *Ibid*, 41.
৫ Creswell. J.W. and Creswell, J.D. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches,* (Newbury Park: Sage, 2017) 4th Edition,19.
৬ Kenneth L. Feder et all, *Ibid*, 44.
৭ সতীশ চন্দ্র মিত্র, *যশোহর-খুলনার ইতিহাস*, (কলকাতা: দেজ, ১৯১৪), ২৬৯।
৮ এ. এফ. এম আব্দুল জলীল, *সুন্দরবনের ইতিহাস*, (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৮৬), ২৯১।
৯ Westland, Sir J. *A report on the District of Jessore: Its Antiquities, its History and its Commerce,* (Calcutta: The Bengal Secretariat Office,1874), 23.
১০ Stewart Tony K. *Witness to Marvels: Sufism and Literary Migration,* (Oakland California: University of California, 2019),12.
১১ ইসমে আজম, *সুন্দরবনামা*, (রংপুর: আইডিয়া প্রকাশন,২০২৫), ৩৫৮।
১২ আকবর আলি খান, *প্রাগুক্ত*, ৭৩।
১৩ Eaton Richard M. *The Rise of Islam and the Bengal Frontier 1204-1760,* (Berkeley: University of California Press, 1993), 210.
১৪ *Ibid.,* p 207.
১৫ *Ibid,* p 211.
১৬ Muhammad Enamul Haq, *A History of Sufism in Bengal,* (Dacca: Asiatic Society, 1975), 99.
১৭ *Ibid,* 265.
১৮ আব্দুল করিম, *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস (১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত)*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩), ১৯০।
১৯ *প্রাগুক্ত*, ১৯৬।
২০ মুহম্মদ আবু তালিব, *খুলনা জেলায় ইসলাম*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৮), ১৫।
২১ Babu Ramshunker Sen, *Report on the agricultural Statistics of Jhenidah, Magurah, Bagirhat and Sundarbans Sub-Divisions, District Jessore, 1872-73,* (Calcutta: Bengal Secretariat press, 1874), 2.
২২ W.W. Hunter, *A Statistical Accounts of Bengal,* Volume II: Districts of Nadiya and Jessore,1877, 228.
২৩ কাবেদুল ইসলাম, *খুলনা জেলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, (ঢাকা: জয়তী, ২০২২), ২৬।
২৪ সাকলায়েন, *প্রাগুক্ত*,৬৭।
২৫ আবু তালিব, *প্রাগুক্ত*, ৯৩।
২৬ সতীশ চন্দ্র মিত্র, *প্রাগুক্ত*, ২০৪।

২৭ H. Blochmann, *Geographical and Historical Notes on the Bardwan and Presidency Divisions of Lower Bengal, in, A Statistical Account of Bengal*, Volume I: Districts of the 24 Parganas and Sundarbans, W.W. Hunter, p. 382.

২৮ এ. এফ. এম আব্দুল জলীল, *প্রাগুক্ত*,২৯১।

২৯ সতীশ চন্দ্র মিত্র, *প্রাগুক্ত*, ২৬৯।

৩০ সতীশ চন্দ্র মিত্র, *প্রাগুক্ত*, ১৫৫।

৩১ আব্দুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, (ঢাকা: কালার পেন্সিল, ১৯৮৮), ২৫।

৩২ সতীশ চন্দ্র মিত্র, *প্রাগুক্ত*, ৪১৫।

৩৩ সতীশ চন্দ্র মিত্র, *যশোহর-খুলনার ইতিহাস ২য় খণ্ড*, (খুলনা: রূপান্তর, ২০০১), ৪৮।

৩৪ Westland, Sir J. *Ibid* 26.

৩৫ খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপের প্রাথমিক প্রতিবেদন (জুন ২০২২), প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় খুলনা ও বরিশাল বিভাগ,সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১১।

৩৬ সতীশ চন্দ্র মিত্র, *প্রাগুক্ত*,২৬৯।

৩৭ খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপের প্রাথমিক প্রতিবেদন (জুন ২০২২), প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় খুলনা ও বরিশাল বিভাগ,সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১১।

৩৮ এ. এফ. এম আব্দুল জলীল, *প্রাগুক্ত*, ২৬৯।

৩৯ খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপের প্রাথমিক প্রতিবেদন (জুন ২০২২), প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় খুলনা ও বরিশাল বিভাগ,সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১১।

৪০ সাক্ষাৎকার: আশরাফ আলী (বয়স: ৮০), সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: লেখক, ঠিকানা: বেদকাশি, কয়রা, খুলনা, তারিখ: ১০/০৩/২০২৫।

৪১ সাক্ষাৎকার: ওয়াজেদ আলী শেখ (বয়স: ১০০), সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: লেখক, ঠিকানা: বেদকাশি, কয়রা, খুলনা, তারিখ: ০২/০১/২০২৫।

৪২ আ. ব. ম আব্দুল মালেক (সম্পাদিত) *কবি এবাদুল্লাহর ও তার কাব্য সমগ্র*, (ঢাকা: সালেহিয়া লাইব্রেরি, ২০২৪), ১৮৭।

৪৩ Muhammad Abdur Rahim, *Social and Cultural History of Bengal,* Vol.1, (Karachi: Pakistan Historical Society,1963), 72-150.

৪৪ সতীশ চন্দ্র মিত্র, *প্রাগুক্ত*, ৪১৫।

৪৫ সতীশ চন্দ্র মিত্র, *প্রাগুক্ত*, ২৬৯।

৪৬ সাক্ষাৎকার: জ্যোতিষ চন্দ্র মণ্ডল (বয়স: ৮২), সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: লেখক, ঠিকানা: বেদকাশি, কয়রা, খুলনা, তারিখ: ১৭/০৮/২০২৫।

৪৭ সাক্ষাৎকার: আব্দুল হক (বয়স: ৮৫), সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: লেখক, ঠিকানা: গোবরা, কয়রা, খুলনা, তারিখ: ০৭/১০/২০২৪।

৪৮ জলীল, *প্রাগুক্ত*, ২৯১

৪৯ মিত্র, *প্রাগুক্ত*, ৩২০।

৫০ সাকলায়েন, *প্রাগুক্ত*, ৬৭-৬৯।